রেনেসাঁস, রিফরমেশান ও স্বামী বিবেকানন্দ

সাগর বিশ্বাস

এক

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ইওরোপের রেনেসাঁস এক যুগান্তকারী মহাবিপ্লব। যুগান্তকারী এজন্য যে তা মানুষের এ যাবৎকালের জ্ঞান, কর্ম ও ভাব রাজ্যের পরজাগতিকতা বা ঈশ্বরমুখীনতার বিপ্রতীপে ইহজাগতিক তথা মানবমুখীন দর্শনচিন্তার উদ্বোধন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। এতকাল শুধু ব্যক্তিজীবনই নয়, সমাজ, রাষ্ট্র সকিছুই নিয়ন্ত্রিত হত ঈশ্বর নামক এক কল্পিত মহাশক্তিধর-এর নামে, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলে কথিত স্বঘোষিত পুরোহিতদের নির্দেশে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশেই এর বড়ো একটা ব্যত্যয় দেখা যায়নি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার ইতিবাচক নির্যাস মধ্যযুগের ইওরোপে লুপ্তপ্রায় হলেও কনস্তান্তিনোপলে (ইস্তাম্বুল) তার যে একটি ক্ষীণ ধারা বহমান ছিল, ১৪৫৩ সালে তুর্কি আক্রমণে তার শোচনীয় পতনের পর সেখানকার বিদ্বজ্জনদের দেশত্যাগ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। অনিবার্যভাবেই সেদিনের বাস্তুহারা পণ্ডিতেরা আশ্রয় খুঁজে নিলেন ইওরোপের নানান দেশে। তাঁদের জ্ঞান, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে চালিত সেইসব দেশের মানুষ, যারা আজন্ম জেনে এসেছে, এই পঙ্কিল পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র মুক্তির উপায় ঈশ্বরমুখীনতা। তিনি তুষ্ট হলে ইহজাগতিক দুঃখক্লিষ্ট ক্ষণিক জীবনের শেষে মানুষের অক্ষয় স্বর্গবাস অবধারিত। এখন নবলব্ধ গ্রীক-রোমক বিদ্যার আলোকে তারা আবিষ্কার করতে পারল যে ভগবত কেন্দ্রিক দর্শনই একমাত্র দর্শন নয়। ইহজগতের প্রতি, মানবজীবনের অর্থ ও সার্থকতার প্রতি তার দৃষ্টি ও ঔৎসুক্য নিবদ্ধ হল। পৃথিবীর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি ও বিকাশ, তার কাছে অন্য অর্থ, অন্য তাৎপর্য নিয়ে এল। এতকাল অধীত ও আচরিত শাস্ত্রীয় ঈশ্বরবাদ বা ডিভিনিজমের মুখোমুখি উঠে এল নবাবিষ্কৃত এই মানববাদ বা হিউম্যানিজম।

নতুন চেতনার রঙে বর্ণিল হয়ে উঠল সমগ্র ইওরোপ। ফ্রান্স ও ইতালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সৃষ্টি হল নতুন জোয়ার। 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের এই অমোঘ জীবন জিজ্ঞাসা মধ্যযুগের একমুখীন ভাবরাজ্যের পতন ঘটিয়ে ভিত গড়ে ছিল আধুনিক সভ্যতার, যা অনিবার্যভাবেই বহুমুখীন হতে বাধ্য। আমরা স্মরণে রাখব যে ইতালিসহ পশ্চিম ইওরোপ রেনেসাঁসের জোয়ারে ভাসলেও তার সাথে ইংল্যাণ্ড সে সময়ে ভেসে যেতে পারেনি। সে তরঙ্গাভিঘাত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে একটু দেরিতে পৌঁছলেও ইতিহাস দেখেছে যে, রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র ইংল্যাণ্ড যেমন অস্থিমজ্জা ও আত্মায় গ্রহণ করতে পেরেছে তেমন আর কেউ পারেনি। সেক্ষেত্রে ফরাসি ও ইতালির কাছে সে অধমর্ণ হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের হাতে সে ঋণ উচ্চ সুদ ও আসলে মিটিয়ে দিয়েছে। আমরা মনে রাখতে বাধ্য, যে-ঈশ্বরবাদের বিপ্রতীপে রেনেসাঁসের উত্থান, তার অটুট দুর্গ ভ্যাটিক্যানের একচ্ছত্র আধিপত্যের স্বর্ণশিখর চুরমার করার মতো সাহস ইংল্যাণ্ডই দেখাতে পেরেছে। রাজা অষ্টম হেনরির

বহুবিবাহে বাদ সেধেছিল ভ্যাটিক্যান তথা পোপের ধর্মমণ্ডলীর কর্ণধাররা, সে হয়তো প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধর্মের কঠিন শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে ক্ষোভও জমে উঠেছিল। পোপের ধর্মধ্বজী রাজাকেও তাই দেখা গেল 'সর্বশক্তিমান' পোপের সাম্রাজ্য খর্ব করে নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে (অ্যাংলিক্যান চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড)। নিজেই হলেন তার সর্বময় পরিচালক। শুধু তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের সমস্ত ক্যাথলিক চার্চ ভেঙে দিয়ে, তার অনুগত যাজকদের দেশ ছাড়া করে চার্চের বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করলেন। এতবড়ো ধর্মবিদ্রোহ ইংল্যাণ্ড কখনও দেখেনি। এটা ধর্ম সংস্কার হতে পারে, হতে পারে রাজশক্তি প্রসারিত করার সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু লক্ষণীয় যা, তা হচ্ছে সমাজে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না কারণ ততদিনে রেনেসাঁসের উত্তাপে পোপের বাঁধন শিথিল হয়েছে, ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস সঞ্চিত হয়েছে। রাজা অষ্টম হেনরির পর অবশ্য তাঁর কন্যা মেরী (রানি ক্যাথরিনের মেয়ে) চেষ্টা করেছিলেন পিতার ধর্মবিদ্রোহের দাগ মুছে দিতে (১৫৫৩-৫৮)। কিন্তু পারেননি। কারণ ততদিনে দেশবাসীর মানসপরিমণ্ডলে পরিবর্তন ঘটে গেছে, তারা আর পোপের অনুশাসনে ক্লিষ্ট হতে চায় না। জাতির এ নবজাগ্রত মনোভাব পরিষ্কার বুঝেছিলেন এলিজাবেথ, রাজা হেনরির দ্বিতীয় রানি অ্যান বোলিনের মেয়ে। এই এলিজাবেথের রাজত্বকালেই (১৫৫৮-১৬০৩) ইংল্যাণ্ড হয়ে ওঠে জ্ঞানে-গরিমায়, শিল্পে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, আর্থ-সামাজিক প্রাগ্রসরতায় পৃথিবীর মধ্যে অনন্য ও অনুকরণীয়। রেনেসাঁস তার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল সে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র চেতনায়।

দুই

'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পেরিয়ে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ঢেউ ভারত মহাসাগর বা বঙ্গোপসাগরের তটভূমি স্পর্শ করতে সময় নিয়েছে অনেক। ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমার কিংবা পর্তুগিজ বণিকেরা যে সময়কালে এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে তখন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল। পলাশি যুদ্ধের পর ১৭৭৪ সালে বাঙলার গভর্ণর দেশের গভর্ণর জেনারেল হলে কলকাতার মান মর্যাদারও উন্নতি হল। তখন আর সে শুধু বাঙলার নয়, সারা ভারতের রাজধানী হয়ে উঠল। সে বছরেই রাধানগর গ্রামে জন্ম হল রামমোহন রায়ের, যাঁর হাতে সূচিত হবে বাঙলার নবজাগরণ। এই সময়কাল থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহ বা পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতাকামী যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্মাধর্ম, স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে বাঙালির অন্তর্জগৎ ও বর্হিজগতের যে সংঘাত আর গ্রহণ বর্জনের তরঙ্গাভিঘাত চলেছিল তার চরম ও পরম উৎকর্ষের কাল হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ। কিন্তু কাজটা শুরু হয়েছিল শতাব্দীর শুরু থেকেই। এখানে আমাদের মনে রাখা ভালো যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০ সাল) এক দশক পার হতেই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা (১৮১৫), বঙ্গাল গেজেট, দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ (১৮১৮), রামমোহনের ইউনিটেরিয়ান কমিটি (১৮২১), ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮), অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিন্দু

অ্যাসোসিয়েশান, জ্ঞান সন্দীপন সভা, কৃষ্ণমোহনের এনকোয়ারার (১৮৩০), ইয়ং বেঙ্গলের জ্ঞানান্বেষণ, ঈশ্বর গুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর (১৮৩১), সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ইত্যাদির মতো প্রচুর সভাসমিতি এবং সংবাদপত্র। বঙ্গসমাজে প্রকাশ্য আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের জন্য এরকম সভা-সমিতি গঠন সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। আগে এসব ছিল না। মানুষের উৎসাহও ছিল না। জীবন ছিল বাঁধাধরা নিয়মে গতানুগতিক। কিন্তু নতুন সামাজিক পরিমণ্ডলে মানুষের বৌদ্ধিক চেতনার উন্মেষ তাকে তাড়িত করল বিতর্কে, মতবিনিময়ে। তার মনোজগত ও বাইরের ক্রমবিকশিত আলোড়ন হয়ে উঠল পত্র-পত্রিকার আলোচ্য বিষয় এবং সভাসমিতির বিতর্ক বস্তু। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি এমন কোনও যুগোপযোগী বিষয় ছিল না যা নিয়ে এইসব সভা-সমিতিতে আলোচনা না হত।" কলকাতাই হয়ে উঠল এই জাগরণের প্রাণকেন্দ্র। যে হিন্দু কলেজ একদিকে নবজাগরণের পীঠস্থান ও অন্যদিকে রক্ষণশীল আক্রমণের লক্ষ্যকেন্দ্র তারও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে শতাব্দীর গোড়ায় ১৮১৭ সালে। সেখানে ডিরোজিও অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন ১৮২৬-এ। প্রাসঙ্গিক ভাবেই স্মরণে রাখতে হবে এই সময়-বৃত্তে জন্মগ্রহণ করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭), অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০), রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামনারায়ন তর্করত্ন (১৮২২), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮) মতো বুধমণ্ডলী। ইংরেজ সরকার সে সময় বাঙলার সামাজিক আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কতকটা তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক প্রাগ্রসরতা প্রতিষ্ঠার জন্য, কতকটা তার রাজধর্ম প্রতিপালনের জন্য। ১৮২৯ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সতীদাহর মতো বর্বর প্রথা বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়ায় পরের বছরেই রক্ষণশীলদের পক্ষে রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হল 'ধর্মসভা' (১৮৩০)। ১৮৪৩ সালে আইন করে দাসত্বপ্রথা রোধ করা হল। ইংল্যাণ্ডে ১৮০৭ সালেই দাস ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছিল, ১৮৩৬-এ তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র কার্যকর করা হয়। এখন ভারতবর্ষেও এ নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটানো হল। এ বছরেই মিশন রো-র ওল্ড মিশন চার্চে হিন্দুধর্মের সহস্র কুসংস্কার ও বীভৎসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মধুসূদন যখন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন পাঁচ বছরের বালক। এর আগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপীনাথ নন্দী (১৮৩২)। অতঃপর ১৮৫৬ সালে ১৮ বছরের তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র দেখছেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ পরিচালনা করছেন (৭ ডিসেম্বর, পাত্রী কালীমতী দেবী, পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)। ছাত্রজীবনে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে ধর্মতত্ত্ব দর্শনের দুই বিপরীতমুখী টানাপোড়েন দেখতে দেখতে বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও নাস্তিক। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে বাঙালির চিন্তা ও চেতনার জগতে যে তুমুল আলোড়ন, বিলোড়ন ও আন্দোলন চলছে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদনরা তা পরিণত বোধ ও বয়স নিয়েই প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে দেবত্ববাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদের প্রতি যে পক্ষপাত তা সেই যুগেরই অন্তর্ধ্বনি। প্রাচ্যের

সাথে পাশ্চাত্যবিদ্যার যে সমন্বয় প্রয়াস, তাও সে যুগমথিত নব আদর্শ। মধুসূদন ও বঙ্কিম উভয়ের সাহিত্যেই তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। পাশ্চাত্য প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে পরাধীনতার গ্লানি মোচনের যে অভিলাষ জাগরিত বঙ্কিম তাতেও অনুপ্রাণিত। পরে রবীন্দ্রনাথও জানাবেন, সমকালের যে তিনটি আন্দোলন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল, রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলন, হিন্দুমেলা পরিচালিত স্বাদেশিকতার আন্দোলন আর বঙ্কিম পরিপোষিত সাহিত্য আন্দোলন। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ শিক্ষিত বাঙালির প্রাণে যে বোধ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল তা থেকে সমসময় ও উত্তরকালের কোনও লেখকের মুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। এরকম যুগাবর্তের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আমরা যাকে রেনেসাঁসের চরমোৎকর্ষ কাল বলেছি, শতাব্দীর সেই দ্বিতীয়ার্ধে, নবযুগের যাবতীয় উত্তরাধিকার নিয়ে একজন ১৮৬১, অন্যজন ১৮৬৩-তে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুই অসম পরিবারে আবির্ভূত দু'জনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছে দু'রকম পদ্ধতিতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে মূলত ব্যবসায়ী পিতামহ দ্বারকানাথের পাশ্চাত্যমুখী ভাবধারা ও গৃহী-সন্ন্যাসী পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক দর্শনের বাতাবরণে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী বিদ্যার্জন শুরু হয় মূলত গৃহাভ্যন্তরে। অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করে নেন। কিন্তু ছাত্রজীবন থেকে পাঠস্পৃহা এবং জ্ঞানান্বেষণ দু'জনেরই ছিল। তবে যে বয়সে নরেন্দ্র দেশ-বিদেশের ইতিহাস, দর্শন, বুভুক্ষুর মতো অধ্যয়ন করছেন সেই বয়সে রবীন্দ্র তেমন অস্থির হয়ে ওঠেননি।

তিন

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও, হিন্দুধর্মাচরণে পৌত্তলিকতার গুরুত্ব বর্জন করেননি। আবার ইওরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভাবিত জীবনযাত্রার জন্যই তিনি ইংরেজ সমাজে 'প্রিন্স'-এর মর্যাদা পেয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পিতা দ্বারকানাথের ওই মধ্যপন্থায় বিশ্বস্ত থাকতে পারেননি। যে বছর মধুসূদন খ্রিস্টান হলেন, সে বছরেই তিনি পুরোপুরি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত সহ আরও একুশ জন। আর রবীন্দ্রনাথ পিতৃধর্মের অনুবর্তী হয়েও জীবনচর্যায় বৃহত্তর মানবধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে 'হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম।' গভীর দুঃখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে যা সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।' এই মানববোধের উন্মেষ তাঁর কম বয়সেই হয়েছিল। যৌবনে ব্রাহ্মসভা-র বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'-কে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল হিন্দুদের যে মাতামাতি এবং মানবতাবিরোধী উন্মত্ততা দেখেছেন সে সবের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ব্যঙ্গ বিদ্রুপে শানিত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণিদের

মতো গোড়া হিন্দুরা তো কেউ কেউ 'স্বধর্ম' রক্ষাকল্পে স্বঘোষিত 'অবতার' হয়ে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ সখেদে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন,

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে।
ছুঁচলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, আমি কল্কি—গাজার কল্কি হবে বুঝি—
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিখুঁজি।

কিংবা অন্যত্র—

রব উঠেছে ভারতভূমে হিন্দু মেলাই ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইকো আর।
লিখছে দোহে হিন্দু শাস্ত্র এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা চামু দিচ্ছে গাল...
এমন হিন্দুঁ মিলবে না রে সকল হিন্দুঁর সেরা,
বোস বংশ আর্য বংশ সেই বংশের এঁরা।
কলির শেষে প্রজাপতি তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য দুটি ভাই,
আর্য দামু, চামু।

রবীন্দ্রনাথের উদার মানবিক ধর্মবোধের মধ্যে আচার সর্বস্ব নিছক পৌত্তলিকতা কিংবা পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিকতা তাঁকে নিরন্তর বিদ্ধ করেছে। এ দেশের জনজীবনে সবচেয়ে পুরনো ওই কঠিন রোগের বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন লড়াই করে গেছেন। পৃথিবীর নানান উন্নত দেশের দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি বারবার জানাতে চেয়েছেন প্রকৃত স্বাধীনতা তারাই উপভোগ করতে পারে যারা ধর্মের মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্ত হতে পারে। যুক্তিহীন অন্ধ মোহগ্রস্ততার চেয়ে নাস্তিকতা শ্রেয় মনে করলেও নিজেকে নাস্তিক বলে চিহ্নিত করতে পারেননি। ঔপনিষদিক দর্শনে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তবুও মনে করি, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ তথা দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মৌলিক দর্শনকে অতিক্রম করে তিনি এক নিজস্ব দর্শনের সন্ধান পেয়েছিলেন। সে তাঁর জীবনদেবতাবাদ।

দেশ ও জাতীয়তাবাদের রূপকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ আর্য অনার্য হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ইংরেজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলকেই শামিল করতে চেয়েছেন। তাঁর স্বদেশভাবনায়, কোনওরকম সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, জাতিবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, অজ্ঞানতা কিংবা বিজ্ঞান-বিমুখতার স্থান ছিল না। দেশকে তিনি সবার পরশে পবিত্রভূমি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। জীবনভর 'দূরকে নিকট' ও 'পরকে ভাই' করার দুর্মর বাসনার ক্রমপরিণতি হিসেবে আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন এক আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ যিনি জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়েও বলতে পারেন 'আমাদের জন্য একটিমাত্র দেশ আছে—সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশান আছে সে হচ্ছে মানুষ।'

এই মানুষ এবং ইহজাগতিকতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই ছিল উনিশ শতকের রেনেসাঁসের মূল চালিকাশক্তি। যা থেকে গোঁড়া হিন্দু ধর্মধ্বজী গোষ্ঠী ভিন্ন সমকালীন কোনও চিন্তাশীল মানুষের মুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না, রবীন্দ্রনাথের তো নয়ই। আর তাঁর চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোটো নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু অনুরূপ কোনও দর্শন বা নিজস্ব জীবনবাদ নির্মাণ করেননি, হয়তো করতে চানওনি। বেদান্তে অনুগত থেকেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন, মানুষের উত্থান ব্যতীত মুক্তি নেই। তাঁর স্বল্পকালীন কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর চিন্তা ও দর্শনে রেনেসাঁসের মানববাদ ও রিফরমেশনের ঈশ্বরবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অনুপুঙ্খ গবেষকেরা এ দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের স্পষ্ট বিভাজিকাও নির্দেশ করতে পারেন। গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় একটা চমৎকার কথা বলেছেন, 'রেনেসাঁস যদি ঈশ্বরের চাকরি নড়বড়ে করে দেওয়ার প্রকল্প হয়, রিফরমেশন ঈশ্বরের পুনর্বহাল প্রকল্প'। আমরা দেখেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব থেকেই রামমোহন ডিরোজিও, বিদ্যাসাগররা যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ঢেউ তুলেছিলেন তা ছিল রেনেসাঁসেরই মর্মবাণী। শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে রানি রাসমণির প্রত্যক্ষ সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাগিচার পরিচর্যা শুরু করলেন সেখানে ঐশ্বরীয় শক্তির বেদিস্থাপনাই হল মূল মন্ত্র। বাগিচা তৈরির বীজ আগে থেকেই ছিল, কেবল আবাদ আর যত্নের অভাবে তা অংকুরিত হতে পারছিল না। রামকৃষ্ণের বাগিচায় যে সোনা ফলল তা সম্ভব হল ঈশ্বরকে নিয়ে মানবজমিন আবাদের মধ্যেই। মুমূর্ষু হিন্দু সম্প্রদায় দেখতে পেল বাগিচার একচ্ছত্র মালির মুখে ঈশ্বর আর মানুষ একযোগে কথা বলেন। বাঙলাদেশে 'ভর'-এর পেছনে মানুষের সারিবদ্ধ 'ছুট' কিছু নতুন নয়। এদেশের কালীতলা, শিবতলা, ত্রিনাথের মেলায় মানুষ তা বিস্তর দেখেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্ততা ঠিক 'ভর' নয়, সে যেন অন্যকিছু। তাঁর ভাবসমাধি নৈঃশব্দের আরাধনা, 'ভর'-এর দেবতার বাঙ্ময়তা নয়। এ যেন নতুন পথ, নতুন সাধনমার্গ। এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথাই নরেন্দ্রনাথ শুনেছেন তাঁর রামমামার মুখে, তাঁর জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টির মুখে। তাই সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে নরেনের গান শুনে রামকৃষ্ণ যেদিন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন, নরেন্দ্রনাথ আর দেরি করেননি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তুখোড় তর্কবাজ, সে দামাল ছেলে রামকৃষ্ণের আচরণের মধ্যে 'হিপনোটিজম' আবিষ্কার করলেও বিনা তর্কে সবকিছু মেনে নিতে চাননি। স্বামী সারদানন্দও লিখছেন, নরেন্দ্রনাথের মনোভাব সে সময় "বিশেষ পরীক্ষাপূর্বক স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অদ্ভুত দর্শন সম্বন্ধীয় কোনও কথা কখনও গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাও স্বীকার"। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের বলতেন, 'সত্যের ছদ্মবেশে যাহা কিছু তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক না কেন সহস্র প্রশ্নে জর্জরিত না করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিও না।' রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ বিপুল অধ্যয়নপ্রিয় নরেন্দ্রনাথকে উত্তরকালেও নিছক ভক্তিবানে ভাসিয়ে নিতে দেয়নি। তিনিও বিশ্বাস করতেন : সত্যের জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে পরিত্যাগ করা যায় না। স্বয়ং ডিরোজিওর অসাধারণ যুক্তিনির্ভর বাক্‌পটুতা ও লিখনশৈলি সেকালে রেনেসাঁসের

মশালবাহী তাঁর ছাত্রসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এবং সমাজ বিপ্লবের রথী মহারথীরা অনেকেই অস্ত্র হিসেবে আত্মস্থ করেছিলেন। এ বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখের নাম তো প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। চিকাগো সম্মেলনে বিবেকানন্দের যুক্তিসিদ্ধ বক্তৃতার মধ্যে এই ধারারই প্রবহমানতা বিদ্যমান। এ বিদ্যা অবশ্য রামকৃষ্ণ তাঁকে দেননি, দিয়েছিল রেনেসাঁস ও তার অনিবার্য প্রভাবসমৃদ্ধ উত্তরকাল। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি রেনেসাঁস থেকে কিছু আত্মস্থ করে থাকেন তবে তা আমার মতে একমাত্র মানবপ্রেম যে মানবকে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিব বা ঈশ্বরের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এ মিলন ছিল অনিবার্য। সময়ের দাবী। মানবমুখীনতা ব্যতিরেকে কোনও তত্ত্বকেই সেদিন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। আজকের দিনে যেমন 'জনগণ' কিংবা সমাজতন্ত্রের নাম না নিয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্ত্রোচ্চারণ সম্ভব হচ্ছে না। এই রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে প্রচুর পড়াশুনা করা যুক্তিবাদী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত নরেন্দ্রনাথ 'নাস্তিক হতে হতে' আস্তিক্যবাদী হয়ে উঠলেন। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়নে চাকরি-সন্ধানী নরেন্দ্রনাথকে যদি ব্রাহ্ম নেতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেবল দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার 'অপরাধে' বিমুখ না করতেন, কিংবা বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান স্কুলের চাকরিটা খোয়াতে না হত তবে ইতিহাসের গতিমুখ কোনদিকে ধাবিত হত বলা শক্ত। আর্থিক অনটনের সেই কঠিন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 'মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা'র আশ্বাসবাণীর মধ্যে সেই অন্ধকারে যদি সামান্য আলোর রেখাও তিনি খুঁজে পান তা অস্বাভাবিক হয় না। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা, নিবিড় পাঠাভ্যাস, অননুকরণীয় লিখনশৈলি, দুর্মর ভ্রমণপিপাসা, ইতিহাস চেতনা, পাশ্চাত্য বিদ্যার্জন, কোনওকিছুর জন্য তিনি রামকৃষ্ণের কাছে বিন্দুমাত্র ঋণী নন।' রামকৃষ্ণের তো সবটাই প্রাচ্যদেশীয়। প্রাচ্যদেশীয় ভক্তি আর গুরুবাদের মিশেলটুকুই কেবল তিনি নরেনকে দিতে পেরেছিলেন। যাঁরা রামকৃষ্ণকে রিফরমেশান বা হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের হোতা বলেন, তাঁরা যে বড়ো একটা ভুল বলেন তা মনে হয় না। একদা যে পথে গৌতম বুদ্ধ কিংবা চৈতন্যদেব ধর্মীয় বান ডাকাতে পেরেছিলেন সেই একই পথে রামকৃষ্ণও বন্যা বইয়ে দিতে পেরেছেন। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগররা যে সংসার পেতেছিলেন সেটা রেনেসাঁসেরই সংসার। প্রথমার্ধের লোকজনরা কেউ দেবত্বের দাবিদার ছিলেন না, মানুষের কথাই বড় করে বলছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলতে শুরু করলেন ঈশ্বরের কথা।" তথাকথিত ধর্মভাবের উর্বর মাটিতে তাঁকে ঈশ্বর আর মানুষের অদ্বৈত দেহধারী বলে গ্রহণ করতে মানুষ আর বিলম্ব করেনি। তাঁর প্রয়াণের পর নবীন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ স্বদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর এই ভারতদর্শন পরবর্তী সময়ে 'শিক্ষে' দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকী আমেরিকায় আয়োজিত পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নের পরিপূর্ণ সভাঘরে তাঁর হাতে যে বিস্ফোরণ ঘটে তার প্রধান উপাদানটাই ছিল ভারততত্ত্ব, ইন্ডোলজি। সেখানে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নামোচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে জরুরি বলে মনে হয়নি। তাঁর ভারতীয়ত্ববোধ, স্বদেশচেতনা কিংবা স্বাধীনতা-স্পৃহা গুরু থেকে অর্জিত ছিল না। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের ম্লান মুখমণ্ডল তিনি নিজ উদ্যোগেই দেখেছেন। পাশাপাশি তারই

মধ্যে অনুভব করেছেন ধর্মের সুপ্রাচীন জালিকাশক্তি যা থেকে ভারতীয়ত্বকে পৃথক করতে পারেননি, চানওনি। তাই মিল, বেন্থাম, হেগেল, ফয়েরবাখ, মার্কস, হিউম, স্পেনসার পড়া সন্ন্যাসী 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়ে ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত-সত্য জগতের মূল ভিত্তি' স্বীকার করেও সমাজবাদের আদর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। বললেন, I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread. অর্থাৎ, নেই মামার চেয়ে কানা মামা নিশ্চয়ই ভালো। আবার তিনিই বিচক্ষণ সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করেন এই বলে যে ভবিষ্যতে সমাজবিপ্লব সংঘটিত হবে চীন অথবা রাশিয়ায়। হলও তো তাই। যদিও ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লব তিনি দেখে যেতে পারেননি। দেখে যাননি তাঁর অনুজ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা 'Vivekananda the Socialist' গ্রন্থটিও। ড. দত্ত তাঁর অগ্রজের মধ্যে যে সমাজবাদীকে দেখেছেন, তিনি কিন্তু সমাজবিপ্লবের প্রশ্নে তাঁর মতো মার্কসীয় তত্ত্বানুসারী হতে পারেননি। কিন্তু সমন্বয়বাদী যে সমাজবিপ্লবের আগুন তিনি জ্বালাতে চেয়েছিলেন, তাও উত্তরকালে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের হাতে ব্যপ্তিলাভ করতে পারেনি। মঠে মন্দিরে তিনি মূলত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এবং হিন্দু সমাজের ধর্মীয় যুগাবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন।

কিন্তু এরকম প্রতিষ্ঠা কি স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছেন কোনওদিন? নিজেকে নিরন্তর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের কাজে, তাদের সেবায়, তাঁদের মঙ্গলার্থে, তাঁদের মধ্যে থাকতে চেয়েছেন—'গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ, অথবা ধনীর ওপর কোনো ভরসা রেখো না... আমরা ধনী ও বড় লোককে গ্রাহ্য করি না।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অধ্যাত্মচেতনার দিশারী, কিন্তু ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন সমাজ সংস্কার। সেদিক থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর কাছের মানুষ। নিজেই বলেছেন, 'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছি।' বিদ্যাসাগর তথাকথিত ধর্মীয় বিধান কিংবা লোকাচারের ধার ধারেননি, আর বিবেকানন্দ 'ধার্মিক' হলেও ধর্ম তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি, লোকাচার, পৌরোহিত্য তাঁর মতে 'সর্বনাশের মূল'। দেশ এবং মানুষের উপরে ধর্মকে স্থাপন করতে চাননি বলেই বলতে পেরেছেন, 'প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর ধর্ম' কিংবা 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।' আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়েও তাঁর মুখে সেই আর্তি ধ্বনিত হয় : ভারতের এখন ধর্ম নয়, প্রয়োজন রুটির।

তাঁর সময়কালে এবং পরে যাঁরা 'দেশপ্রেমিক' বলে চিহ্নিত ও সম্মানিত, স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ তাঁদের কারুর থেকে কম ছিল না। অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস—'দেশের উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা।' আর তা অর্জনের জন্য ললিত আলাপচারিতা নয়, 'প্রয়োজন হচ্ছে বোমা।' এখানেই উঠে আসে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশ্ন। সেই বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা থেকে জানা যায়, একবার আমেরিকায় (১৯১১) মিস ম্যাকলিয়ড (স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহধন্য আমেরিকান মহিলা যাঁকে তিনি 'জো' নামে সম্বোধন করতেন) তাঁকে বলেন যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা ডেনহ্যামের মুখে তিনি শুনেছেন বিপ্লবীদের ঘর তল্লাসী

করতে গেলে প্রায়শই তাঁরা বিবেকানন্দের বই পেতেন। আর স্বনামধন্য বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ তো স্মৃতিকথায় লিখেই গেছেন, 'আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মীয় শিক্ষকের চেয়ে বেশি মনে হয়েছে একজন রাজনৈতিক পয়গম্বর।' সেই আদর্শ অনুসারেই তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ 'নিবেদিতা' নামকরণের মাধ্যমেই তাঁর এই আইরিশ মানসকন্যাকে দেশে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, 'মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে জাগাতে হবে'।

Mass অর্থাৎ জনগণ, কোটি কোটি নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের দল একদিন শৃঙ্খল ছিড়ে বেরিয়ে আসবে—এ ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস, 'শূদ্র যুগ আসবেই আসবে—এ কেউ রোধ করতে পারবে না।' যে স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় তা আয়ত্ব করার জন্য তিনি যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না, শূদ্র জাগরণ না হওয়া পর্যন্ত 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

প্রশ্ন থেকে যায়, এই বিবেকানন্দকে আমরা কতটুকু জানতে চেয়েছি? কতটাই বা চর্চার মধ্যে রেখেছি? চাষার কুটির থেকে, জেলে-মালো-মুচি-মেথরের ঝুপড়ি থেকে, মুদির দোকান কিংবা ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে যে ঘর্মাক্ত মানব সমাজের সগৌরব উত্থান তাঁর কাম্য ছিল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরাই বা কীভাবে পেল তাঁকে?

হিন্দু ও মুসলমানের মেধা আর শক্তির সমন্বয়ে যে নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন তাঁর ছিল, বর্তমান ভারতবর্ষে সে দ্বৈত ছবিটাও কি সুসাস্থ্যের অভিজ্ঞান রাখে।

পাঁচ

আমরা দেখেছি উনিশ শতকে বাঙলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যভূমি ছিল। যেমন,

১. ধর্মীয় কুসংস্কার ও চিরাচরিত ধারণার বিপ্রতীপে যুক্তিবাদী প্রশ্নের অবতারণা,

২. টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি প্রভাবিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনা,

৩. নারীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার সনাতনি বেড়া ভেঙে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমাজের আগ্রহ তৈরি এবং

৪. ইওরোপীয় গণতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার প্রভাবে নাগরিক স্বাধীনতার স্পৃহা তথা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা। পাশাপাশি সংস্কারধর্মীতা (যা ব্রাহ্মবাদীরাও চেয়েছিলেন) ও রামকৃষ্ণ প্রভাবের কথা মাথায় রেখে আরও সংক্ষেপে বলা যায়—প্রথমত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ও মানববাদের আবাহন এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার উদ্ধারণ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পায়ু জীবন ও কর্মধারার মধ্যে এই দু'টি লক্ষ্যেরই আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। একদিকে তিনি যেমন রেনেসাঁসের সন্তান, অন্যদিকে রিফরমেশানেরও প্রবক্তা। ইওরোপে রেনেসাঁসের পরে আসে রিফরমেশান। জে. এ. সাইমন্ডসের মতে, মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক রেনেসাঁস, দ্বিতীয় অঙ্ক রিফরমেশান আর তৃতীয় অঙ্ক রেভল্যুশান বা বিপ্লব। আবার তত্ত্বগতভাবে কেউ কেউ বলবেন রিফরমেশান আসলে রেনেসাঁসের অস্বীকৃতি। এসব

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গভীরে না ঢুকেও খোলা চোখে যে বিবেকানন্দকে আমরা দেখতে পাই তিনি রেনেসাঁসের মূল কর্মসূচি যে ইহজাগতিকতা এবং মানবতাবাদ তাকে সারাজীবন বহন করেছেন। এই সত্য তাঁর সমগ্র রচনা, বক্তৃতা, আলোচনা এবং জীবনচর্যার মধ্য থেকেই প্রমান করা যায়। দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে প্রবন্ধের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি এ সত্যটাও উপেক্ষণীয় নয় যে রেনেসাঁসের মধ্যেই থেকে যায় রিফরমেশানের বীজ। ইওরোপীয় রেনেসাঁস এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁস—উভয় ক্ষেত্রেই তা সত্য। আমাদের রেনেসাঁসের ভগীরথ রাজা রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীগণ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বরখাস্ত করেও একজনকে ঠিক বহাল রেখেছেন। পক্ষান্তরে ডিরোজিও বা ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী অনেক র‍্যাডিক্যাল। বিদ্যাসাগর মূলত নাস্তিক্যবাদকেই আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমে এসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব সব একাকার। হিন্দুধর্মের 'জঞ্জাল' সরিয়ে তিনি তার শুদ্ধিকরণ চেয়েছেন। অর্থাৎ 'ধর্ম'-কে নস্যাৎ তো নয়ই, তিনি তার বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতাসহ তথাকথিত ধর্মের অসারতা উপলব্ধি করেও ঈশ্বরতত্ত্বকে বর্জন করেননি। তবে তাঁর ঈশ্বর মামুলি নন, রেনেসাঁসের নির্যাস আর আপন মনের মাধুরী মেশানো 'জীবনদেবতা'। এই পরিপ্রেক্ষিতটা এড়িয়ে গিয়ে বিবেকানন্দ এমনকী শ্রীরামকৃষ্ণের কোনওরকম মূল্যায়ন একদেশদর্শী ও ইতিহাস-নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যদি রেনেসাঁস থেকে কিছু পেয়ে থাকেন তা কেবল মানবপ্রেম। বাকি সবকিছুই রিফরমেশান, ঈশ্বরবাদের পুনর্বাসন। তারও স্রোত অন্তর্বাহী ছিল সমাজে, মননে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতির প্রাঙ্গনে। বিবেকানন্দে এসে দু'টি ধারারই মিলন সংঘটিত হয়েছে। একদিকে রেনেসাঁস, অন্যদিকে রিফরমেশান। বিবেকানন্দ সব্যসাচীর মতো একহাতে রেনেসাঁসের পৌরুষ ও বলিষ্ঠ বিদ্রোহের প্রচার চালিয়েছেন, অন্যহাতে রিফরমেশানের স্থিতিস্থাপকতা ও পুনর্বিন্যাসের ব্রত পালন করেছেন। যাঁরা মনে করেন, মানুষের মুক্তি সংগ্রামের তৃতীয় অঙ্ক রেভলিউশান, বিবেকানন্দ তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর অজস্র রচনায়, বক্তৃতায়। তাই ক্ষণজন্মা এই অনন্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর বিপুল বৈচিত্র্যময় জীবনের বিদ্রোহী চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ ও দার্শনিক অনুভবের কোন অংশ কতটা, কীভাবে, বর্তমান ও আগামীদিনের মানুষ আত্মস্থ করবে, একমাত্র সময়ই তার যথার্থ উত্তর জানাবে। ❑

তথ্যসহায়তা

বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (২য় খণ্ড) বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১ম সং ১৩৬৪

গোপাল হালদার : ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা, নবারুণ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৬১

স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ (২য় ভাগ) উদ্বোধন কার্যালয়, ১১শ সং ১৯৬৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ ১১শ মুদ্রণ ১৪১৮

Sister Nivedita : Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda, Udbodhan office 5th. ed. 1966

স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের চোখে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

চতুষ্কোণ : বইমেলা সংখ্যা ১৪১৮

নানা বিবেকানন্দ (কোরক সংকলন ২০১২)